অঙ্কুরেই বিনষ্ট এক ফুল-শেখ রাসেল

ইমদাদ ইসলাম

মাথা ভর্তি অগোছালো চুলের সুন্দর একটি মুখাবয়ব, মায়াবি চেহারা মুহুর্তে যে কারো মন কেড়ে নেওয়া এই কিশোরকে একবার দেখলেই সারা জীবন মনে থাকবে। এ ছেলেটি হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোটো ছেলে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোটো ভাই শেখ রাসেল। ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর ধানমণ্ডির স্মৃতি-বিজড়িত বঙ্গবন্ধু ভবনে রাসেল জন্মগ্রহণ করেন। রাসেলের কথা শুনলেই প্রথমে যে ছবিটি আমার সামনে আসে, তা হলো- হাস্যোজ্জ্বল, প্রাণচঞ্চল এক ছোট্ট শিশুর দুরন্তপণা, যে শিশুর চোখগুলো হাসি-আনন্দে ভরপুর। - যে মুখাবয়ব ভালোবাসা ও মায়ায় মাখা।

শেখ রাসেলের জন্মের সময় তৎকালীন পাকিস্তান জুড়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচার ও তৎপরতা চলছিল। একদিকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান, অন্যদিকে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী মুহম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহ। রাসেলের জন্মের দিনটিও বঙ্গবন্ধু ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে প্রচারকাজে চট্টগ্রামে ছিলেন। সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পরে এক লেখায় বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা লিখেছেন, 'রাসেলের জন্মের আগের মুহূর্তগুলো ছিল ভীষণ উৎকণ্ঠার। আমি, কামাল, জামাল, রেহানা ও খোকা চাচা বাসায়। বড় ফুফু ও মেঝ ফুফু মায়ের সাথে। একজন ডাক্তার ও নার্স এসেছেন। সময় যেন আর কাটে না। জামাল আর রেহানা কিছুক্ষণ ঘুমায়, আবার জেগে ওঠে। আমরা ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে জেগে আছি নতুন অতিথির আগমনবার্তা শোনার অপেক্ষায়। মেঝ ফুফু ঘর থেকে বের হয়ে এসে খবর দিলেন আমাদের ভাই হয়েছে। খুশিতে আমরা আত্মহারা। কতক্ষণে দেখব। ফুফু বললেন, তিনি ডাকবেন। কিছুক্ষণ পর ডাক এলো। বড় ফুফু আমার কোলে তুলে দিলেন রাসেলকে। মাথাভরা ঘন কালো চুল। তুলতুলে নরম গাল। বেশ বড়সড় হয়েছিল রাসেল।'

বঙ্গবন্ধু দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের লেখার খুব অনুরাগী ছিলেন। যখনই সময় পেতেন, স্ত্রী ফজিলাতু নেছা মুজিবকে রাসেলের লেখা পড়ে শোনাতেন তিনি। এভাবে ফজিলাতু নেছা মুজিবও দার্শনিক রাসেলের ভক্ত হয়ে যান। সবচেয়ে ছোট সন্তানটির নাম রাসেল রাখেন তিনি। পরিবারের পদবিসহ পুরো নাম দাঁড়ায় শেখ রাসেল।

'আমাদের ছোট রাসেল সোনা' গ্রন্থে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মৃতিচারণ করেন , রাসেল বেড়ে উঠেছে অদ্ভুত পরিবেশে। রাসেল কখনো দেখেছে বাড়িভর্তি অচেনা অজানা মানুষজন আবার কখনো কেউ নেই, এমনকি আব্বাও। আব্বা যখন ছয় দফা দিলেন তারপরই তিনি গ্রেফতার হয়ে গেলেন। রাসেলের মুখে হাসিও মুছে গেল। সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে রাসেল আব্বাকে খুঁজত। রাসেল যখন কেবল হাঁটতে শিখেছে, আধো আধো কথা বলতে শিখেছে, আব্বা তখনই বন্দি হয়ে গেলেন। মা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আব্বার মামলা-মোকদ্দমা সামলাতে, পাশাপাশি আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, সংগঠনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। সংগঠনকে সক্রিয় রেখে আন্দোলন-সংগ্রাম চালাতেও সময় দিতে হতো। আব্বার সঙ্গে প্রতি ১৫ দিন পর আমরা দেখা করতে যেতাম। রাসেলকে নিয়ে গেলে ও আর আসতে চাইত না। খুবই কান্নাকাটি করত। ওকে বোঝানো হয়েছিল যে, আব্বার বাসা জেলখানা আর আমরা আব্বার বাসায় বেড়াতে এসেছি। আমরা বাসায় ফেরত যাব। বেশ কষ্ট করেই ওকে বাসায় ফিরিয়ে আনা হতো। আর আব্বার মনের অবস্থা কী হতো, তা আমরা বুঝতে পারতাম। বাসায় আব্বার জন্য কান্নাকাটি করলে মা ওকে বোঝাতেন এবং মাকে আব্বা বলে ডাকতে শেখাতেন। মাকেই আব্বা বলে ডাকত।'

রাসেলের বেড়ে ওঠার স্মৃতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিখেছেন, "রাসেলের সবকিছুতেই যেন ছিল ব্যতিক্রম। ও যে অত্যন্ত মেধাবী তার প্রমাণ অনেকভাবেই আমরা পেয়েছি। আমাকে হাসুপা বলে ডাকতো। কামাল ও জামালকে ভাই বলতো আর রেহানাকে আপু। কামাল ও জামালের নাম কখনও বলতো না। আমরা নাম বলা শেখাতে অনেক চেষ্টা করতাম। কিন্তু ও মিষ্টি হেসে মাথা নেড়ে বলতো ভাই। দিনের পর দিন আমরা যখন চেষ্টা করে যাচ্ছি, একদিন ও হঠাৎ করে বলেই ফেলল, 'কামমাল', 'জামমাল'।"

রাসেলের মধ্যে মানবীয় গুণাবলি সেই শিশুকালেই ফুঠে উঠেছিলো । কোমলমতি মনের মানবীয় গুণাবলির কথা বলতে গিয়ে এই বইয়েই আরেকটি ঘটনারও উল্লেখ করে শেখ হাসিনা লিখেছেন, 'মা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন। রাসেলকে কোলে নিয়ে নিচে যেতেন এবং নিজের হাতে খাবার দিতেন কবুতরদের। হাঁটতে শেখার পর থেকেই রাসেল কবুতরের পেছনে ছুটতো, নিজ হাতে ওদের খাবার দিত। আমাদের গ্রামের বাড়িতেও কবুতর ছিল। কবুতরের মাংস সবাই খেত। ...রাসেলকে কবুতরের মাংস দেওয়া হলে খেত না। ওকে ওই মাংস খাওয়াতে আমরা অনেকভাবে চেষ্টা করেছি। ওর মুখের কাছে নিয়ে গেছি, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ওই বয়সে ও কী করে বুঝতে পারতো যে, ওকে পালিত কবুতরের মাংস দেওয়া হয়েছে!' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাসেলকে নিয়ে লিখেছেন "কালো পিঁপড়া দেখলে রাসেল চেঁচিয়ে বলত- ভুট্টো ভুট্টো। এই শিশু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সবার মুখে শুনতে শুনতে মেধাবী চেতনায় বিষাক্ত পিঁপড়াকে ভুট্টোর সঙ্গে মিলিয়েছিল।" শিশু রাসেলের বিচক্ষণতা প্রমাণে এই একটা দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

ছোটো ভাই রাসেলের প্রতি বোন শেখ রেহানার ছিল অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালোবাসা। পিঠাপিঠি ভাইবোন হিসেবে খুনসুটিও কম হতো না দুই ভাইবোনের। ১৯৭৫ সালের ৩০ জুলাই বড়ো বোন শেখ হাসিনার সঙ্গে জার্মানিতে যাওয়ার সময় বিমানবন্দরে বিমানে ওঠার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত রাসেল শেখ রেহানাকে জড়িয়ে ধরে রাখেন। জার্মানিতে গিয়ে শেখ রেহানা পরিবারের সকলের সাথে তার আদরের ভাই রাসেলকেও একটি চিঠি লিখেন। চিঠিতে প্রিয় ছোটো ভাইয়ের প্রতি হৃদয়ের ভেতর থেকে উচ্চারিত হয়েছিলো সুললিত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু দু:খের বিষয় সেই চিঠি আর রাসেলের কাছে পৌঁছেনি।

পঁয়ত্রিশ বছর পর পাওয়া সেই চিঠিগুলো সম্পর্কে শেখ রেহানা তাঁর লেখায় এভাবেই লেখেন –'ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর খেলা, পঁয়ত্রিশ বছর আগে আব্বা-মা, ভাই-ভাবীদের কাছে যে চিঠি লিখেছিলাম আজ সেই চিঠিগুলো আমাকেই খুলতে হলো। চিঠিগুলো জার্মানি থেকে লেখা। খামের মুখ বন্ধ। ডাকপিয়ন তার মতো করে যথারীতি ডাকবাক্সে রেখে গিয়েছিল। চিঠিগুলো আপা যখন বত্রিশ নম্বর থেকে আমার হাতে এনে দিলেন, কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার হাত-পা অবশ হয়ে গিয়েছিল। বুকের ভেতরটা কষ্টে দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছিল।' বঙ্গবন্ধুর ছোট মেয়ে শেখ রেহানা স্মৃতিচারণ করেছেন, 'রাসেল তো জন্মের পর আব্বাকে বাইরে কমই দেখেছে। ও জেলখানায় গেলে আর ফিরতে চাইত না। বলত এটা আব্বুর বাড়ি। আমি আমাদের বাড়িতে যাব না। আসো আমরা আব্বুর বাড়িতেই থাকি। কতই-বা বয়স ছিল তার। তিন বা চার। ও তো বুঝত না। আমাদের জেল গেট থেকে ফিরে আসতেই হতো। সে রাতে রাসেল আর ঘুমাতে পারত না।'

রাসেল যেমন বাবাকে একমুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করতে চাইতেন না, তেমনি বঙ্গবন্ধুও রাসেলকে যতটুকু সম্ভব কাছে রাখার চেষ্টা করতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তোলার জন্য সারাদেশে ছুটতে হয়েছে উল্কার বেগে। তবুও প্রিয় সন্তানদের, বিশেষ করে আদরের রাসেলকে সময় দেওয়ার চেষ্টা করতেন তিনি। বিদেশ কিংবা দেশের ভেতর যেখানেই যান না কেন, রাসেলকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। গণভবনেও কখনও কখনও নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে।

কামাল ভাইয়ের আমন্ত্রণে ৩২ নম্বরের বাড়িতে একদিন সন্ধ্যায় আবাহনী ক্রীড়া চক্রের সব বন্ধুরা এলেন । বঙ্গবন্ধুর সাথে শেখ কামাল ভাইয়ের বন্ধুরা ছবি তুলতে দাঁড়ালো । আবাহনীর সবাই এসেছে খবর পেয়ে নীচ থেকে দৌড়ে এলো রাসেল। এসেই বঙ্গবন্ধুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লো গ্রুপ ছবিতে সবার সাথে। বঙ্গবন্ধু ছবি তোলার ফাঁকে সবার উদ্দেশ্য বললেন , ' ও তোমরা সবাই আবাহনীর , আমি তো আবার ওয়ান্ডারসের চীফ পেট্রোন '। বলা মাত্র আবাহনীর ক্ষুদে সমর্থক ছোট্ট রাসেল বাবার (' ওয়ান্ডারসের ' চীফ পেট্রোন) কথায় অভিমানে গাল ফোলালো আর প্রতিবাদ করে বলে উঠলো বাবাকে , ' কি তুমি ওয়ান্ডারস ? তোমার সাথে ছবিই তুলবো না ' বলেই ছুটে চলে গেলো রাসেল। ও এমন, বঙ্গবন্ধুর সাথে সাথে সবাই হেসে উঠলেন।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বাদি এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, পনেরোই আগস্টের সেই কালরাতে বঙ্গবন্ধু ভবনের দোতলায় যখন নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চলছিল, তখন শেখ রাসেল ঘাতকদের কাছ থেকে নিজের প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন ভবনের নিচতলায় বঙ্গবন্ধুর রেসিডেন্ট পিএ কাম রিসেপশনিস্ট আ ফ ম মুহিতুল ইসলামের কাছে। সেই অন্ধকার রাতে মুহিতুলকে জড়িয়ে ধরে রাসেল বলেছিলেন, 'ভাইয়া, ওরা আমাকে মারবে না তো?' মুহিতুল তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন, 'না, ওরা তোমাকে কিছু করবে না।' তিনি নিজেও মনে করেছিলেন, নিষ্পাপ শিশুর শরীরে কোনো জঘন্যতম পাপীও আঘাত করতে পারে না। কিন্তু তার বিশ্বাস ভাঙতে সময় লাগেনি।

ওই সময় রাসেল কান্নাকাটি করছিল, 'আমি মার কাছে যাব।' একপর্যায়ে ঘাতক সৈন্যরা মুহিতুল ইসলামকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে রাসেলকে নিয়ে পুলিশ বক্সে আটকায়। তার পরও মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করতে থাকলে মেজর আজিজ পাশা ল্যান্সারের একজন হাবিলদারকে রাসেলকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেন। ওই হাবিলদার শেখ রাসেলকে হাত ধরে 'চলো, তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাই' বলে দোতলায় নিয়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পর ওপর থেকে গুলির আওয়াজ এবং কান্নাকাটি ও চিৎকার শোনা যায়। পরে ওই হাবিলদার নিচে নেমে গেটের কাছে এসে মেজর আজিজ পাশাকে বলেন, 'স্যার সব শেষ।' শেখ রাসেলের লাশ বঙ্গবন্ধুর শয়নকক্ষে তার দুই ভাবি সুলতানা কামাল এবং রোজী জামালের মরদেহের মাঝখানে একটি লুঙ্গিতে মোড়ানো অবস্থায় পাওয়া যায়। তার পরনে ছিল হাফপ্যান্ট। গুলিতে মাথা উড়ে গিয়েছিল। ১৬ আগস্ট পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে রাসেলকেও বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়। ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেলের জন্মদিন। শেখ রাসেল বেঁচে থাকলে আজ মধ্যবয়সি একজন মানুষ হিসেবে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে আত্ম নিয়োগ করতে পারতেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বঞ্চিত হলো দেশ ও জাতি

#

পিআইডি ফিচার